আত্মকথা

atmaja

Association of Adoptive Parents- এর মুখপত্র

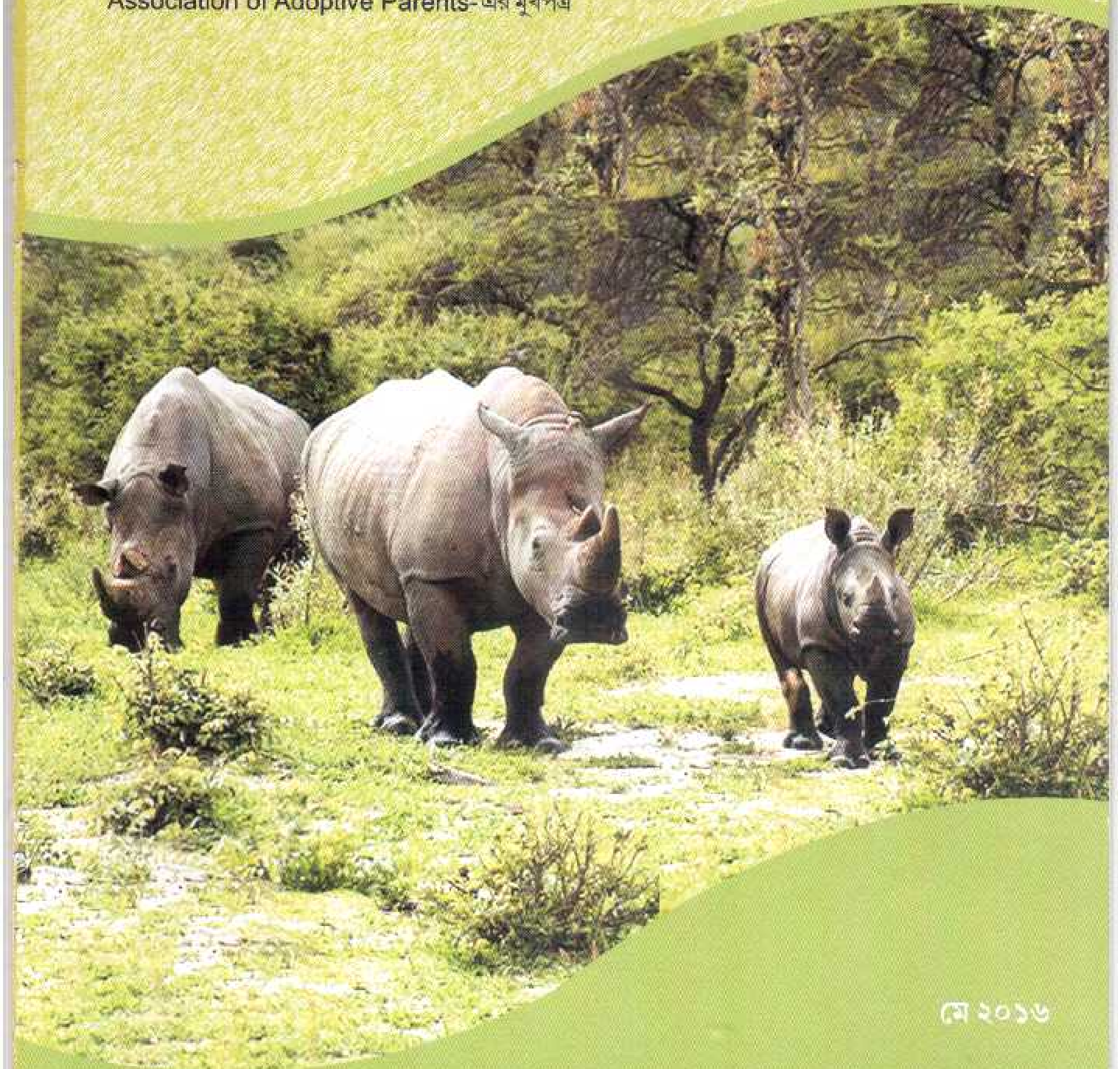

মে ২০১৬

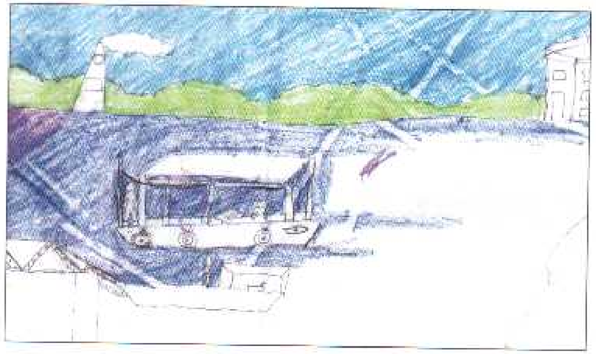

আবীর গঙ্গোপাধ্যায়

যোগীন্দ্র মন্ডল

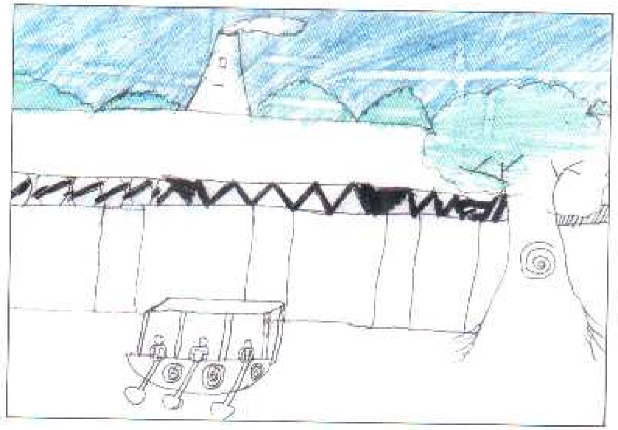

ইমন ঘোষ

atmaja

Chairperson
Sheemantika Nag

Vice-Chair
Anup Dewanji

Secretary
Subir Banerjee

Asstt. Secretary
Sankar Naskar

Treasurer
Sanjay K. Sikdar

Member
Nilanjana Gupta
Anjan Basu Chowdhury
Achin Basu
Sharmishtha Roy
Subha Mukherjee
Satabdi Das
Nilanjana Dasgupta
Debashish Roy
Prabhat Kumar Chattopadhyay

atmakatha

Editor
Gautam Gupta

Editorial Board
Swapan Naskar
Satabdi Das
Anup Dewanji
Sanjay K. Sikdar

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন পর্ব শেষ। এখন কেবল ফল প্রকাশের অপেক্ষা। এই সঙ্গে এদেশের গণতন্ত্রের একটা বড় পর্ব শেষ হবে।

মনে রাখা যেতে পারে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৫-র মধ্যে পৃথিবীতে ঔপনিবেশীক যুগের শেষ হয় এবং ১২০টি দেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। এরা সবাই গণতন্ত্র হিসেবে নিজেদের যাত্রা শুরু করেছিল। দুঃখের বিষয় এই যে এদের বেশির ভাগই কিন্তু সেই গণতন্ত্র ধরে রাখতে পারেনি। অনেকেই ডুবে গেছে সামরিক বা মৌলবাদী শাসনের গহ্বরে।

ভারতবর্ষ পেরেছে। এখানে আমরা গণতন্ত্র বলতে বুঝি সংসদীয় গণতন্ত্র। পাঁচ বছরে একবার ভোট। সব প্রাপ্তবয়স্কের একটা ভোট। সেই ভোটে তৈরি হয় লোকসভা বা বিধানসভা। যে দল বেশি আসন পায় তারাই সরকার গড়ে। দেশ বা রাজ্য চালায় পাঁচ বছর।

গণতন্ত্র মানে কিন্তু পাঁচ বছরে একটা ভোট নয়। আরও কিছু। প্রথম প্রশ্ন: সবারই কি ভোটের অধিকার থাকবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, পশ্চিমের গণতন্ত্রে (যেখান থেকে এই ব্যবস্থা ধার নেওয়া হয়েছে) গোড়ার দিকে কিন্তু সবার ভোট ছিলনা। ভোট দিতে পারতেন কেবল এক অংশ বিত্তবান পুরুষেরা। এরপর একে একে অন্যান্য জনগোষ্ঠি ভোটের অধিকার পেলো। সব শেষে পেলেন মহিলারা — ব্রিটেনে ১৯৩১ সালে। ভারতের সংবিধান রচনা কালেও এই বিতর্ক উঠেছিলো। সবাই ভোট দিতে পারবে? যে বেকার, যে নিরক্ষর সেও? নেহেরু - অম্বেডকার জোরালো অবস্থান নিয়েছিলেন—হ্যাঁ সবাই, ২১ বছর বয়স হলেই ভোট দিতে পারবে। পরে তা নামিয়ে ১৮ করা হয়।

এর পরের কথা, বড় কথা, প্রত্যেকে নিজের ভোট নিজে দেবে। কেউ তাকে জোর করবে না, ভয় দেখাবে না, লোভ দেখাবে না। এটা এই ব্যবস্থায় খুব জরুরি।

তবে গণতন্ত্র মানে শুধু ভোট তো নয়। এর অন্যতম শর্ত হল মত প্রকাশের স্বাধীনতা, কোনো মতের ভিত্তিতে সংগঠন তৈরি করা, বক্তৃতা করা, পত্রিকা প্রকাশ করার স্বাধীনতা। সে মত সবই সরকারের বিরুদ্ধে হোক। কখনো কখনো এই অধিকার ছাট্-কাট্ করার চেষ্টা হয়েছে। এদেশের মানুষ তা মেনে নেয়নি।

আজ যখন আরও একবার একটা নতুন সরকার গড়তে আমরা চলেছি, তখন আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার বোধকে আর একবার ঝালিয়ে নিতে হবে। নিরন্তর এই বোধকে জাগ্রত রাখতে হবে যে আমরা আর আমাদের সন্ততিরা স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের নাগরিক। আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার আছে। যার মধ্যে আছে ভোট দানের অধিকার। কেউ যেন সেই অধিকার আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে না পারে।

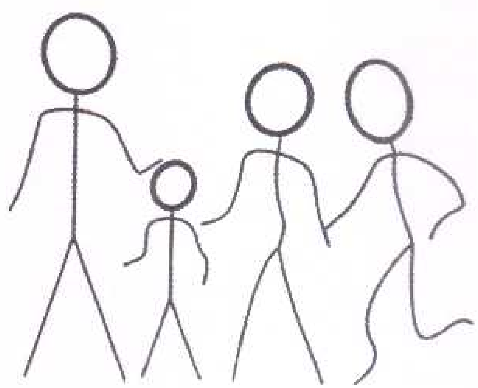

'আত্মকথা'-র পক্ষে স্বপন নস্কর কতৃক ৫১৭ যোধপুর পার্ক, কলকাতা-৭০০০৬৮ থেকে প্রকাশিত এবং 'টাইমস গ্রাফিক্স', ২০/১/১এন, বালীগঞ্জ স্টেশন রোড, কলকাতা-১৯ থেকে মুদ্রিত।

উপকারী ভূত

সায়ন্তনী বোস

(মূল গল্প 'দ্য হেল্পফুল স্পিরিট'-এর অনুবাদ করেছেন সুগত হাজরা)

ব্রহ্মদৈত্য আসলে ব্রাহ্মণ ভূত। গাছে থাকে। ভৌতিক শ্রেণিবিভাগে ব্রহ্মদৈত্যের স্থান সবার উপরে। প্রাচীন আদিবাসী বিশ্বাসে ব্রহ্মদৈত্যকে গাছের আত্মা ভাবা হত। পরে সেই বিশ্বাসে হিন্দু ধর্মের রঙ চড়েছে।

(ঋণ ঃ প্রথম প্রকাশ ইংরাজীতে — "দ্য ওয়েরটাইগার", ২০০০ গ্রন্থে – সায়ন্তনী বোস, অরুন্ধতি দাশগুপ্ত, বানি গুপ্ত ও নীলাঞ্জনা গুপ্ত প্রণীত। এখানে বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হল)

বাড়ির ঠিক পাশেই বেলগাছটা, কামানের গোলার মত বড় বড় ফলওয়ালা। বেলের নরম, মোটা শাঁস থেকে তৈরি হত ঠান্ডা শরবৎ। কখনও তার ডালে এসে বসত সবুজ ডানা বসন্তবৌরী, সবুজ পাতার ফাঁকে লুকিয়ে। তার ঠোঁটের অবিরাম টুকটুক - টুকটুক - টুকটুক শব্দে গরমের দুপুরে আরো ঝিম ধরত। গাছের ছায়ার নিচে বাস করে কয়েকটা কাঠপিঁপড়ে — প্রকাশ ওদের আসা যাওয়ার ব্যস্ত পথ থেকে পা সরিয়ে নিল। ওদের চোয়ালও বেশ শক্ত আর কামড়েও বেশ বিষ। ও দাঁড়িয়ে রইল গাছের দিকে চেয়ে — মায়ের বলা গল্পের কথা ভাবতে ভাবতে।

সেটা ছিল মাঝরাত্তির। সরস্বতী ঘুম ভেঙ্গে দেখল প্রকাশ ঘুমের মধ্যে কাতরাচ্ছে। রাত্রের রোজকার কাজটা পেয়ে গেছে আর কি। সরস্বতী কাঁধে অল্প ঝাঁকুনি দিয়ে তুলে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল– বেশি দূর নয় –জানলা অবধি। সেটা ছিল একটা পুরনোবাড়ি, বাথরুম ছিল অনেক দূরে, তার ফলে ওর মা'র পক্ষে এই ভাবে ওর প্রয়োজন মেটানোটাই সহজ হত। ও ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই — চোখ বন্ধ পায়জামার দড়ি খোলা– সব সেরে-টেরে আবার বিছানার দিকে ফিরে গেল। সরস্বতী ছেলের গায়ে একটা পাতলা চাদর টেনে দিল।

আবার ঘুম এসে গিয়েছিল। হঠাৎ সরস্বতীর মনে হল জানলা দিয়ে বয়ে আসা জ্যোৎস্নার স্রোতকে আড়াল করে — তার সামনে এসে দাঁড়াল বিশাল এক ছায়ামূর্ত্তি। সে কিছু না শুনেও যেন প্রবল একটা অস্তিত্বকে অনুভব করতে পারল–তার ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলার মত স্বরে যেন বলল– 'এভাবে আমার মানহানি করছিস কেন'? মানহানি? আমি আপনার কী মানহানি করেছি? —তুই কিনা আমার বেলগাছটার তলায় রোজ সকালে পুজো দিবি, তার তলায় বসে আমার কাছে প্রার্থনা করবি— তা নয়, রোজ রাত্রে ছেলেকে দিয়ে তুই আমার গাছটার মাথায় হিসি করাস। তোকে অভিশাপ দিচ্ছি, পরের জন্মে—না না ঠাকুর, আর কোনও দিন এমনটি হবেনা – আমার ভুল হয়ে গেছে।

আমি জানতাম না গো। বুঝতে পারিনি। আমি আজ সকাল থেকেই তোমার পুজো শুরু করব। তুমি দেখো। আমাকে ক্ষমা করে দাও ঠাকুর। সরস্বতীর গলার স্বরের আন্তরিকতায় প্রসন্ন হয়ে ব্রহ্মদৈত্য আবার ওর গাছে ফিরে গেলো।

তারপর থেকে প্রতিদিনই ঘুম ভেঙ্গে সরস্বতী বেলগাছটার পায়ের কাছে গিয়ে পুজো দিত। কয়েকটা ধূপ জ্বালিয়ে, খানকয়েক নকুলদানা রেখে ওর শেখা মন্ত্রটা বলত — ওম্ শান্তি, শান্তি, শান্তি। গড় হয়ে প্রণাম করে, শাঁখ বাজিয়ে ও দিনের কাজ শুরু করত।

ততদিনে সরস্বতীর এই পুজোপাঠ তার সংসারের কাজকম্মের সঙ্গে বেশ মিশ খেয়ে গেছে— তখন সরস্বতী আবার একদিন তাকে স্বপ্নে দেখল।

আমি তোর কাজে প্রসন্ন হয়েছি — দরাজ ভারী গলায় সে বলল—'বল তুই কি বর চাস'। কোনও দিন কোনও সমস্যায় পড়লে আমার কাছে আসিস। যা চাইবি তাই পাবি। তারপর আরও কিছু মাস কেটে গেছে। সরস্বতী ততদিনে ভূতের বরের কথা বেমালুম ভুলে গেছে — কিন্তু ভক্তি ভরে রোজকার পূজো-পাঠে কোনও ছেদ পড়েনি। একদিন ও যখন জামাকাপড় গোছাচ্ছে ঘরদোর ঝাড়পোছ করছে, হঠৎ ওর স্বামী এসে উপস্থিত। প্রচণ্ড উত্তেজিত। চুল এলোমেলো, আলুথালু জামাকাপড়, দুঃশ্চিন্তায় মুখ শুক্নো। এসেই ও দেরাজ খুলে জামাকাপড় ঘাঁটতে লাগলো, ড্রয়ার টেনে বের করে কাগজপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে কি যেন খুঁজতে লাগল ব্যস্ত ভাবে।

ব্রিটিশ আমলের শেষদিক, সেই সময়টা ছিল একটা রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়। সব পরিবারেরই কেউ না কেউ ছিল কোনও গুপ্তসমিতির সদস্য—তারা বিক্ষোভে অংশ নিত, মিছিলে বা সত্যাগ্রহে যোগ দিত। সেখানে একটা গুজবই যথেষ্ট ছিল—এই জায়গায় কোনও গোপন কাজকর্ম চলছে। ব্যস রাজশক্তি একেবারে হামলে পড়ত—প্রমাণ দাও 'এইদিন এইসময় তুমি কোথায় ছিলে—কী করছিলে। তুমি এখন কী কাজ কর, প্রমাণ দাও। এরকম চলতেই থাকবে। তুমি বেশ জোরের সঙ্গে উত্তর দিতে না পারলেই — জেল, পুলিশের খাতায় নাম উঠবে—এক নম্বরের বদমাশ। কি হয়েছে কী? সরস্বতী জিজ্ঞেস করে। ওর বর উদভ্রান্ত চোখে চেয়ে বলে—কোথায় গেল ওটা খুঁজে পাচ্ছিনা—কাগজের টুকরোটাকে—এখানেই তো রেখেছিলাম—ওটায় প্রমাণ ছিল ৩রা এপ্রিল আমি রাণিগঞ্জে ছিলাম। আমি জানিনা, ওটা দেখাতে না পারলে আমার কি হবে। ও সরস্বতীকে কাগজের খুঁটিনাটি বর্ণনা দিল। আর দুজনে মিলে মরিয়া ভাবে ওটাকে খুঁজে চলল। পেল না। ওরা কাল আসবে, জানিনা ওদের কি বলব।

সেই রাত্রে সরস্বতী যখন ঘুমতে গেল

তখনও ওর বরের কথাগুলো কানে বাজছে। চোখ খোলাই ছিল, ঘুমও আসছিল না। কড়িকাঠের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে কখন যেন সেই বিশাল ছায়ামূর্তিটা ওর সামনে ওসে দাঁড়াল। 'খুব বিপদে পড়েছ দেখছি' - বলল সে —'অথচ তুমি আমার কাছে আসনি তো'। আমি তোমায় সাহায্য করতে পারি। কি হয়েছে কী?

সরস্বতী বলল কিভাবে ওরা কাগজের টুকরোটাকে আকাশপাতাল খুঁজেছে, কিন্তু পায়নি। ব্রহ্মদৈত্য মন দিয়ে শুনল—তারপর বলল 'দেরাজের তাকের বাঁদিকে পিছনের দিকে দেখো। টুকরোটা একটা ফাটলের মাঝে ঢুকে গেছে। কাল সকালে পেয়ে যাবে।'

পরদিন সকালে সরস্বতী ভোর ভোর উঠল। ধূপ জ্বালিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে পূজো সাঙ্গ করে তবে দেরাজের পিছনের ফাটলগুলোতে খোঁজাখুঁজি শুরু করল। আর — 'ওমা, এইতো কাগজটা—একটা কোনা শুধু বেরিয়ে আছে।' ধাক্কা দিয়ে ওর বরকে ঘুম থেকে তুলে সরস্বতী কাগজটা ওর বরকে দেখাল।

সেইদিন থেকে বেলগাছের তলায় দুজন মিলেই পুজো করত, আর ছোট্ট প্রকাশ ধূপ জ্বালাত। অবশ্য সব বাড়িতেই এমন উপকারী ভূত নেই।

ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ

শর্মিষ্ঠা রায়

সূত্রধার গুন, গুন, করে গান গাইছেন—

পত্থর মিট্টিসে ফৌজ বনাই
কাঠ সে কাটোয়ার
পাহাড় উঠাকে ঘোড়া বনাই
চলি গোয়ালিয়ার

নটী— কিগো আজ কি সব গুন্ গুন্ করছ আবার হিন্দীতে—আজ কিসের নাটক?

সূত্রধার— আজ একটি মেয়ের গল্প। আমাদের দেশের অন্তরের সবটুকু সত্য নিংড়ে যদি একটি আধারে ধরা যায়, একটি মেয়ের সম্পর্কে যদি শতবর্ষ ধরে জনসাধারণ জেনে থাকে, মাটি তার হাতে সংগ্রামী সৈনিক হয়ে উঠত, কাঠ তার হাতের স্পর্শে হয়ে যেত তরবারি, পাহাড় হয়ে যেত গতিচঞ্চল ঘোড়া—তবে সে মেয়ে কিরকম তাই জানতে আজকের নাটক ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ।

নটী— তবে শুনি।

১ম দৃশ্য—'নেপথ্যে বাজবে'—এই আকাশে, আমার মুক্তি আলোয় আলোয়

সূত্রধার— ভারতবর্ষের ঠিক মাঝখানটিতে ছোট্ট একটি রাজ্য ঝাঁসী। বুন্দেলখণ্ডের মধ্যে। স্থানটি শুষ্ক, রুক্ষ, ফসলের দাক্ষিণ্যে বঞ্চিত। রাজধানী ঝাঁসী স্থাপত্য গর্বে বলীয়ান। যখনকার কথা বলছি তখন ঝাঁসী ইংরেজের একটি করদ রাজ্য। ১৮৫৩ সালের নভেম্বরের এক সকাল। রাজপুরীতে শোনা যাচ্ছে সানাইয়ের আওয়াজ—শুভ অনুষ্ঠানের শঙ্খধ্বনি ঘন্টার শব্দ।

(রাজপথে বনিক বেশি পথিক)—কি ভাই? শুনলাম যে রাজা গঙ্গাধররাওয়ের শরীর অসুস্থ। কালও মন্দিরে যাবার সময়ে গীতাপাঠ শুনছিলাম আজ মঙ্গলঘন্টা বাজছে—কী হল? মহারাজ সুস্থ হয়ে উঠলেন?

২য় পথিক— না হে। মহারাজ একই রকম অসুস্থ। কিন্তু আজ রাজদম্পতি সম্পর্কিত দাদার একমাত্র পুত্রকে দত্তক নিচ্ছেন। সেই দত্তকগ্রহণ অনুষ্ঠানেরই মঙ্গলশঙ্খ বাজছে।

১ম পথিক— রাজা কি নিঃসন্তান?

২য় পথিক— রাজার একটি পুত্র হয়ে তিন মাসেই মারা যায়। সেই থেকেই তো মহারাজ অসুস্থ হয়ে পড়েন।

১ম পথিক— কিন্তু এভাবে মৃত্যুশয্যায় দত্তক? পরে করলেই তো হত। হিন্দু বিধবারা দত্তক গ্রহণ করতেই পারেন।

২য় পথিক— রাজা জীবিত থাকাকালীন দত্তক নিলে, ইংরেজ সেই দত্তককে মেনে নেবে।

রাজবংশ ও রাজত্ব অটুট থাকবে। এখনতো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী স্বত্ববিলোপ- এর স্বরচিত নিয়ম প্রয়োগ করে রাজাদের মৃত্যুর পর উপযুক্ত পুরুষ উত্তরাধিকারী নেই এই অজুহাতে করদ রাজ্যগুলো দখল করছে।

১ম পথিক— কিন্তু ইংরেজ কি এটা মেনে নেবে?

২য় পথিক— সম্পূর্ণ বৈধ দত্তক গ্রহণ—মেনে নেওয়া তো উচিত।

১ম পথিক— যদি না নেয়?

২য় পথিক— না নিলে খুব বিপদ। আমাদের যেটুকু স্বাধীনতা, যেটুকু সুবিচার আছে সেটুকুও চলে যাবে। সাহেবদের সম্পূর্ণ তাঁবে থাকতে হবে।

১ম পথিক— কিন্তু রাজপুত্র তো নাবালক মাত্র পাঁচ বছর রাজ্য দেখবেন কে?

২য় পথিক— আরে শোনো। মহারানীকে দেখনি বুঝি? মাঝে মাঝেই তো মহালক্ষ্মী মন্দিরে পুজো দিতে আসেন। বুদ্ধিদীপ্ত, বীরমূর্তি। সুন্দরীও বটে। রানী নিশ্চয়ই পারবেন। পথিকরা—চলো যাই....পথিকদের প্রস্থান।

২য় দৃশ্য (ঘোষণা)

আমাদের রাজা গঙ্গাধর রাও আজ দিবা এক প্রহরে প্রয়াত হয়েছেন। সন্ধ্যায় লছমীতাল হ্রদে তাঁর শেষ কৃত্য হবে। ...

৩য় দৃশ্য

সূত্রধার— দরবার ঘর, দেওয়ানজী আছেন, আছেন মেরোপন্থ তাম্বে, রানির পিতা—আর গণ্যমান্য ঝাঁসীবাসীরা। রানী এলেন। দামোদর, রানীর পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে।

সকলে— প্রণাম রানীসাহেবা—

রানী— কল্যাণমস্তু। আসন গ্রহণ করুন।

মেরোপন্থ— আজ ফাল্গুন মাসের শেষ দিন। মনে আছে তো মনু?

রানী— আছে বাবা। কাল দরবারে আসবেন এলিস সাহেব। দেওয়ানজী আমাদের খরীজগুলি পরপর ম্যালকম সাহেব, ডালহৌসী সাহেবের কাছে পৌঁছেছে তো?

দেওয়ানজী— সমস্তই। জানানো হয়েছিল যে দামোদরকে দত্তক গ্রহণ কেন বৈধ। আমাদের পূর্বপুরুষরা ও আরও যে সব রাজ্য এভাবেই প্রয়োজনে দত্তক নিয়েছেন তাদের কথাও জানানো হয়েছে।

মেরোপন্থ— যেমন দাতমীর বর্তমান রাজা বিজয়বাহাদুর কুড়োনো-ছেলে জালৌনের মহারাজাও ভিন্নগোত্র থেকে পালিত পুত্র, অবছার ভূতপূর্ব রাজা সুজনসিংহও রাজা তেজসিংহের গৃহীত দত্তক।

দেওয়ানজী— শুধু তাই নয়, ১৮৩৯ সালে আলগীর জায়গীরদার খণ্ডেরাও মারা যাবার পর

ইংরেজের অনুমতিক্রমে তাঁর বিধবাপত্নী নিজেদের জ্ঞাতি থেকে একজনকে দত্তক নেন—এ সমস্তই জানানো হয়েছে।

রানী— কাল মহামান্য এলিস আসবেন ডালহৌসি সাহেবের নির্দেশ নিয়ে। দেওয়ানজী, একটু দেখবেন সব যেন প্রস্তুত থাকে।

দেওয়ানজী— তাই হবে। প্রণাম রানী সাহেবা।

৪র্থ দৃশ্য

সূত্রধার— পরের দিন ১৬/৩/১৮৫৪ প্রভাত। প্রভাতে মার্জনা করা হয়েছে দরবার গৃহের অঙ্গন। রুপোর পাত্রে বেলফুলের কুঁড়ি ভেজানো। ধূপের গন্ধে দরবার আমোদিত। চিকের আড়ালে বসেছেন রানী, স্নান সমাপনান্তে শ্বেত চন্দেরি শাড়ি ও সাদা চোলী পরনে—পাশে দামোদর রাও।

(দরবার কক্ষের দীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে এলিসের উঠে আসার ঠক্ ঠক্ শব্দ।)

এলিস— Please may I come in.

(সকলে সসম্ভ্রমে)—আমরা আপনারই অপেক্ষায়—

এলিস— (রানীকে) Good Morning; Your Highness!
আমি লর্ড ডালহৌসির বার্তা বহন করে এনেছি।

রানী— প্রণাম - মেজর এলিস আমি সেই বার্তার জন্য উৎসুক। আপনি পড়ুন। এলিস—(কাগজ বার করে) উপযুক্ত পুরুষ উত্তরাধিকারীর অভাবে 'ঝাঁসী' ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল। 'ঝাঁসী' বরাবরই ব্রিটিশ আশ্রিত রাজ্য তেহরী, অরছার মত স্বাধীন রাজ্য নয়। সুতরাং ঝাঁসী পুনর্গ্রহণ করা হল। স্বাক্ষরিত—লর্ড ডালহৌসি।
(সভায় বিপুল নিস্তব্ধতা)

রানী— মেরী ঝাঁসী দুংগী নেহী।
(এই বাক্যটির অনুরণন ঘরে ছড়িয়ে পড়ে—অন্য কণ্ঠস্বরে হালকা করে, কথাটা বার বার বলতে হবে)

সূত্রধার— ঐতিহাসিক উক্তি। সেদিনকার মানচিত্রে, ব্রিটিশ ভারতের পরিসরের তুলনায়, বছরে বিশলাখ টাকা খাজনার ঝাঁসীরাজ কত দুর্বল কত ছোট তা জানলে মনে হবে এতখানি কম ক্ষমতা নিয়ে এতখানি নির্ভীক উক্তি যদি রানী করে থাকতে পারেন তবে সেই উক্তি অমর হোক। কারণ সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে এই উক্তিই প্রথম এবং একমাত্র প্রতিবাদ।
ঝাঁসী শহরের উপান্তে যে বুড়ো মকাই পোড়ায় সে নাতনীকে শোনায়—
বড়ি বড়িয়া থী ও রানী

যিসনে ঝাঁসী ন ছোড়েঙ্গি বোলী।।
যিসনে সিপাহী কো লিয়ে লড়াই কিয়ে
ঔর অপনে খায়ে গোলী।

৫ম দৃশ্য (মহালক্ষ্মীর মন্দির, একদল সৈন্য চলেছে পুজো দিতে।)

১ম সৈন্য— দোকানি ভাই! আজ একটু সুন্দর করে আমার ডালি গুছিয়ে দাও। আজ শেষ বারের মত মহালক্ষ্মীকে দর্শন করে দেশে ফিরে যাব।

দোকানি— কেন হে? আজ শেষ কেন? আর আসবে না নাকি?

২য় সৈন্য— না হে, তা না। ঝাঁসী এখন ইংরেজ অধিকারে। তারা আর আমাদের সৈন্যদলে রাখবে না। তিন মাসের মাইনে দিয়ে সৈন্যদল ভেঙ্গে দিল। আমরা তাই চলে যাচ্ছি।

দোকানি— তোমাদের উর্দি?

অন্য সৈন্য— সব জমা দিতে বলেছিল।

দোকানি— দিলে?

অন্য সৈন্য— কয়েক জন দিয়েছে।

দোকানি— তুমি?

১ম সৈন্য— বেতোয়ার জলে ভাসিয়ে দিলাম ভাই। জীবনের সব কিছুই সঙ্গে ভেসে গেল। আর রোজগার নেই — সম্মান নেই, ও নদীর জলেই থাক।

দোকানি— পুজো দিয়েই কি দেশের দিকে বেরিয়ে পড়বে?

২য় সৈন্য— প্রায় তাই। একবার কেল্লায় শেষবার ঝাঁসীরাজের পতাকা দর্শন করে যাব—কাল থেকেই তো উড়বে ইউনিয়ন জ্যাক। নামিয়ে দেওয়া হবে ঝাঁসীর পতাকা।

দোকানি— সে কী? আর রানী? আমাদের পাঁচবছরের রাজপুত্র?

সৈনিক— আরে দেখো — রানী এসেছেন পুজোদিতে - ওই যে সাদা ঘোড়ায় - রানীর সাধের সারেংগী ঘোড়া।

দোকানি— আজ সবাই এসেছেন দেখছি। মন্দারবাঈ, কাশী কুনবীন, গঙ্গাবাঈ, রানীর সর্বক্ষণের সঙ্গীরা।

সৈনিক— আরেক জন সধবা বাঈকে দেখছি। ওঁকে তো চিনিনা।

দোকানি— উনি তো রানীর বিমাতা চিমাবাঈ। দেখছ না সঙ্গে আছেন মেরোপন্থ তাম্বে—রানীর বাবা।

সৈনিক— রানী যেন গম্ভীর।

দোকানি— হ্যাঁ তাই একটু চিন্তিতও যেন।

১ম সৈনিক— এরপরেও চিন্তা হবে না?

২য় সৈনিক— কেন রে? রানী তো রানীই আছেন তেমনি সুন্দর, তেমনি সপ্রতিভ।

দোকানি— তোমরা জান কি না জানিনা। মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে বিধবা হলেন, রাজ্য হারালেন—মাত্র ৫-৬ হাজার টাকা বৃত্তিতে তাঁর নিজের ও এই বিশাল আশ্রিত গোষ্ঠীর খরচ চালাতে হবে—তারপর ও চিন্তা হবে না?

২য় সৈনিক— রানীর ঘোড়াটি কিন্তু দারুন।

১ম সৈনিক— জানোনা বুঝি? রানী ঘোড়ার ব্যাপারে দারুন জ্ঞানী। রাজার ঘোড়াওয়ালা একে বিক্রী করতে পারছিল না—কেউ চড়লেই ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিত। রানী দেখে-শুনে তার ফুসফুস থেকে পেরেক বার করালেন। দেখো ঘোড়াটি রানীর মতই সপ্রতিভ।

দোকানি— হ্যাঁ রানী ঘোড়া চেনেন—চড়েনও সুন্দর। হ্যাঁ ভাই তোমরা যে চলে যাচ্ছো—রানীকে রক্ষা করবে কে?

সৈনিক— ঠিকই। বিশেষত দেশের অবস্থা ক্রমেই আগুন হয়ে উঠছে।

৬ঠ দৃশ্য (রানী ও মেরোপন্থ তাম্বে)

রানী— বাবা! কিভাবে কাটবে দিন?

মেরোপন্থ— কেঁদোনা মা! তুমি যে বলে ছিলে তীর্থে গিয়ে কেশ মুন্ডন করবে–চল আমরা তীর্থ করে আসি।

রানী— আমাকে ঝাঁসীর বাইরে যেতে দিতে ইংরেজের আপত্তি আছে।

মেরোপন্থ— তবে পণ্ডিত বা গুরুর কাছে যাই চল—তাঁরা যদি কোনো পথ দেখাতে পারেন।

রানী— ওরা বলেন ধর্ম কর্মে মন দাও—সকল চিন্তা ঈশ্বরকে সমর্পণ কর। কিন্তু পারিনা বাবা। আনন্দ, দামোদরকে আমি আনন্দ বলি—ওর তো কিছুই থাকলো না। আমার থাকলো না কোনও ক্ষমতা স্বাধীনতা। বিলাতে এত টাকা খরচ করে আপিল করলাম—কোনও জবাব এল না।

মেরোপন্থ— কী ভেবেছ মা? তোমার মন ও বুদ্ধি কি বলে?

রানী— নিরন্তর তাই ভাবছি বাবা। ভোরে উঠি স্নান সেরে শিব গড়িয়ে শিব পুজো করি, তখন থেকেই আমার আকুলতা ঈশ্বরকে জানাই।

মেরোপন্থ— দেখো মা, পথ একটা বেরোবেই—দেখো, দামোদর তোমাকে ডাকছে—আমি যাই।

রানী— এসো বাবা। আনন্দ, চলো বাবা খেতে যাবে। তারপর গুরু আসবেন— পড়তে বসতে হবে। তোমার অনেক কাজ—ইংরিজি শিখতে হবে।

আনন্দ— মা, তুমি খাবে না?

রানী— হুঁ, চলো, এক সঙ্গে খাই।

আনন্দ— মা, তুমি কি খাওয়া হলে গুরুমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে সারেংগী ঘোড়াকে নিয়ে

বেরোবে?

রানী— হ্যাঁ আনন্দ, এই সময় তুমিই আমার জীবনের একমাত্র আনন্দ। তোমার সঙ্গে দুপুরে আমার দেখা হবে।

আনন্দ— দুপুরে আমরা দুজনে একসঙ্গে মাছকে খাওয়াব—মা, মাছের খাওয়ার কাগজে আমি আজ রামনাম লিখব।

রানী— না বাবা তা হয়না—এগারোশো কাগজ তুমি আর আমি একসঙ্গে লিখব। তুমি পড়, আমি দুপুরের খাওয়ার আগেই ঘুরে আসছি।

আনন্দ— তুমি চলে গেলে আমার একটুও ভালো লাগেনা—তাড়াতাড়ি আসবে কিন্তু।

রানী— চলি আনন্দ।

৭ম দৃশ্য (সন্ধ্যাকাল। রাজপুরীতে সমবেত সুধীজন। রানী আছেন। আছেন দেওয়ানজী আছেন মেরোপন্থ।)

মেরোপন্থ— মনু তোমার আপীলের জবাব এল কি? আজ মধ্যদিনে ইংরেজ ঘোড়সওয়ারকে রানী মহলের দিকে আসতে দেখলাম।

দেওয়ানজী— হায় মেরোপন্থ সাহেব। কোথায় আপিল? সরকার বাহাদুর রাজা গঙ্গাধর রাওয়ের পুরোনো ঋণ বাবদ রানীমার কাছে ৩৬০০০ টাকা দাবি করে পাঠিয়েছেন।

মেরোপন্থ— সে কী? তা কী করে সম্ভব?

রানী— দেওয়ানজী, তা যে অসম্ভব তা ভাল করে বুঝিয়ে আপনি একটা খরীতা পাঠান।

দেওয়ানজী— মহারাজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তিনটে বাড়ি এবং অলঙ্কারও ইংরেজরা নিয়ে যেতে চাইছে। ওদের বক্তব্য এগুলি আনন্দের। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে ও সেগুলি পাবে—ততদিন সেগুলি ইংরেজদের থাকবে।

রানী— ফিরিঙ্গীদের আশ্চর্য দু'মুখো নীতি। আনন্দ নাকি সামাজিক ভাবে মহারাজের উত্তরাধিকারী, রাজনৈতিক ভাবে নয়। অতুলনীয় যুক্তি।

৮ম দৃশ্য (রানীমহলের একটি মাত্র খোলা জানালা দিয়ে শোনা গেল - সমস্বরে, ৩/৪ বার)

মুলুক খুদাতালাকা
মুলুক বাহাদুর শাহকা
অম্মল লক্ষ্মীবাঈকা
ঝাঁসী লক্ষ্মীবাঈকা
(গোলমালের শব্দ ক্রমে মিলিয়ে গেল।)

আনন্দ— মা, ওরা কী বলছে মা? ওরা কোথায় যাচ্ছে? কে ওরা?

রানী— ওরা দিল্লী গেল—দেশি সৈন্য ওরা, বিদ্রোহ করছে।

আনন্দ— তুমি ওদের পয়সা দিলে কেন?

রানী— এখানে যতজন ইংরেজ ছিল। নারী শিশু নির্বিশেষে ওরা তাদের হত্যা করে অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়েছে। ওদের খরচের জন্য ওরা তিন লক্ষ টাকা চাইছিল। আমি কোথায় পাব বাবা। তাই আমার গয়না থেকে আমি এক লক্ষ টাকার গয়না দিলাম।

দামোদর— এবার কি বিপদ হবে মা?

রানী— জানিনা বাবা, আমাকে সব লিখে কর্ণেল ফ্রেজারকে জানাতে হবে—আমি একটু দেওয়ানজীকে ডেকে পাঠাই।

সূত্রধার— সেই ভয়ংকর টালমাটাল দিনে ইংরেজরা ঝাঁসীর শাসনভার রানীর হাতে দিয়ে ঝাঁসী ছেড়ে চলে গেল।

শেষ দৃশ্য (নবম)

সূত্রধার— শ্রদ্ধাভাজন দামোদর রাও, আপনি ঝাঁসীরানীর পুত্র। আপনার কাছে রানীর সম্পর্কে, ঝাঁসীর তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানতে চাই। সে সব কাহিনিতো প্রায় অবলুপ্ত। বাঈ সাহেবার নাম পর্যন্ত ইংরেজ রাজত্বে বহুদিন উচ্চারণ করা যেত না—অনেক কাহিনি জানতে ইচ্ছে করে।

দামোদর রাও— বলুন কী জানতে চান? ওই তো তাঁর ছবি। রোজ পুজো করি, তবে দিন শুরু হয়।

সূত্রধার— এ ছবি কোথায় পেলেন?

দামোদর রাও— মন থেকে আঁকিয়েছি। সারেংগী ঘোড়ার উপরে মা—আর তো কোনও স্মারক নেই।

সূত্রধার— বাঈ সাহেবা যখন রাজ্যভার হাতে পেলেন সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে?

দামোদর রাও— খুউব। মার সেকি খুশি সেকি উৎসাহ। সকালে স্নান সেরে পাঠানী পোষাক পরে মা কাজে বেরিয়ে যেতেন রানীমহল থেকে।

সূত্রধার— তারপর?

দামোদর রাও— একদিন মা অনেকগুলি টাকা এনে আমাকে দেখালেন—রুপোর টাকা। বললেন, আনন্দ দেখো ঝাঁসীর টাকা ঝাঁসীর ট্যাকশালে তৈরি। দেখলাম টাকায় মায়ের ছবি, মায়ের নাম লেখা টাকা—কী আনন্দ যে হয়েছিল।

সূত্রধার— তারপর?

দামোদর রাও— এখন বুঝি মা যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। আর ঝাঁসীকে, কেল্লাকে এমন সুদৃঢ় সুন্দর করে তৈরি করছিলেন যাতে সেখানে একটা স্বাধীন সুন্দর রাজ্য তৈরি হয়।

কত লোক সারাদিন আসত, কত বৈঠক। মা ঘুরে ঘুরে সারাদিন কাজ দেখতেন। কিন্তু আমার খবর রাখতেন ঠিক। রাতে আমার কাছে শুতেন। ঘুম ভেঙে গেলে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। খেতে না চাইলে বলতেন গায়ে জোর না হলে সিদ্ধবক্স হাতীর পিঠে চড়বে কেমন করে? বলতেন এত মিষ্টি খেওনা আনন্দ— মোটা হয়ে যাবে। সেই ন'মাস যেন আনন্দ ফূর্তির বন্যা বইছিল।

একদিন মা বললেন, আনন্দ এবার হরিদ্রা কুঙ্কুম উৎসব করব। করব রানী মহলে। সেদিন কী খুশীর দিন—সারাদিন সানাই বাজল। সব বাঈরা এলেন— মায়ের জন্য উপহার নিয়ে। মা কিছু নিয়ে সব দিয়ে দিলেন একেরটা অন্যকে। এখনও চোখে ভাসে, মা একটা সাদা শাড়ি পরে সব বাঈদের হলুদ মাখাচ্ছেন, কুঙ্কুম পরাচ্ছেন, মিঠাই খাওয়াচ্ছেন।

সূত্রধার— তারপর?

দামোদর রাও— মাঝে মাঝে মাকে হাতে গড়া রুটি আর লাল পদ্মের পাপড়ি নাড়তে নাড়তে চিন্তামগ্ন দেখতাম। পরে জেনেছি ওগুলো বিদ্রোহের প্রস্তুতি ছিল।

সূত্রধার— তারপর?

দামোদর রাও— তারপর শুরু হল রুদ্ধশ্বাস দিন। ঝাঁসীর ফটকগুলি বন্ধ হয়ে গেল। মা দৌড়ে দৌড়ে এসে আমাকে দেখে যেতেন। বলতেন—আনন্দ দেখনা ফিরিঙ্গীদের কেমন হটিয়ে দিই। তারপর, গোলাগুলি, কামান, কান্নাকাটি। মার ওষ্ঠাধর দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় কঠিন। শুনলাম ফিরিঙ্গীরা এসে পড়েছে। আমরা হারছি। তারপর একদিন গভীর রাত্রে মায়ের কোলে ঘোড়ার পিঠে চেপে দৌড় দৌড়। তারপর যুদ্ধে যুদ্ধে তাঁবুতে তাঁবুতে কেটে গেল ক'মাস। কাল্পি, বেতোয়া, কুঁচ সব যুদ্ধেই হারতে হারতে অবশেষে গোয়ালিয়র।

তারপর? তারপর মা একদিন আমাকে ডেকে বললেন আনন্দ আমি যদি না থাকি তুমি, কাশী, রঘুনাথ রাও, রামচন্দ্র রাও এদের সঙ্গে থাকবে। ভয় পাবেনা, এদের কথা শুনবে। মায়ের বড় বড় দুই চোখের স্নেহ দৃষ্টি আমাকে ছুঁয়ে গেল—মা যেন কত দূরে চলে যাচ্ছেন, সাদা পাজামা পরে, লাল কুর্তা পরে—গলায় মুক্তার মালা, হাতে শমসের, মাথায় মুরেঠা, সাদা রাজরত্ন ঘোড়ায় চড়ে মা—আমার বাইশ বছরের মা উড়তে উড়তে চলে গেলেন, আর ফিরে তাকালেন না।

তারপর? সেদিন সন্ধ্যায় সোনেরেখা নালার পারে রক্তমাখা মাকে ঘোড়া থেকে নামানো হল। মা বললেন তোমরা আনন্দকে দেখো, আমার টাকা থেকে আমার ফৌজকে টাকা দিও—আমার মৃতদেহ যেন ফিরিঙ্গীদের হাতে না পড়ে। সেইদিন সন্ধ্যায় ঘাসে আগুন ধরিয়ে মাকে দাহ করা হল। আমরা এগারো জন বনে বনে ঘুরে

পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালাম। থেকে থেকে মায়ের কথা মনে পড়ত—এক সঙ্গে মাছকে খাওয়ানো, ঘোড়ায় করে পালানো, রাতে আদর করে ঘুম পাড়ানো। আর আর হারানো সম্পত্তি উদ্ধারের চেষ্টায় ইংরাজের দয়াভিক্ষা করে বাঁচবার চেষ্টায় কেটেই গেল গোটা জীবন।

সূত্রধার— মায়ের ওপর রাগ হয়না? অভিমান হয়না, এই অভিশপ্ত জীবনের জন্য?

দামোদর রাও— অভিমান? মাকে চেতনায় নিয়েই তো বেঁচে আছি। আমার নিজের মা বাবা এসেছিলেন, তাঁদের আর কোনও সন্তান ছিলনা। আমার দারিদ্র দেখে তাঁদের সম্পত্তি দিতে চেয়েছিলেন নিতে পারিনি—তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কটা তৈরি হলনা। আমি তো সেই নীল পাঠানী পোষাক পরা মাথায় সাদা মুরেঠা বাঁধা মাকে চিনি, সারেংগী ঘোড়ার ওপরে, চিনি সেই রাতে প্রদীপ জেলে মাথায় হাত বোলানো মাকে, দুপুরবেলা শিবাজী মহারাজের গল্প শোনানো, চাণক্য শ্লোক বলা মাকে—মা গল্প বলতেন আর মার গলায় মুক্তোর মালা দুলতো, আমি মুগ্ধ চোখে দেখতাম—এ মা তো আমার নন।

তারা ফিরে গেলেন। অভিমান? নাঃ—শুধু মায়ের জন্য কষ্ট হয়।

সৌজন্যে—মহাশ্বেতা দেবীর 'ঝাঁসী'

“আলোর পথযাত্রীঃ আমি আর আমার রবীন্দ্রনাথ”

শুভা মুখোপাধ্যায় (পিয়া)

এক্কা-দোক্কা আর পুতুল খেলার বয়স পেরিয়ে রবিঠাকুরের ধূলামন্দির, অপমানিত, ভারততীর্থ ইত্যাদি কবিতাগুলি যখন আমার মধ্যে একটু একটু করে চারিয়ে যেতে শুরু করেছে সেই সময়ে আমাদের বাড়িতে একজন আসতেন। বাড়ির বড়রা তাঁকে এবং আমরা ছোটরা লতাদি বলে ডাকতাম। বাড়ির ভিতর চৌহদ্দিতে তার প্রবেশ নিষেধ ছিল। সাফসুতরো হয়ে গেলে পর তিনি হাত দুটি আঁজলা করে থাকতেন আর পরিশ্রমিক দেওয়া হত দূর থেকে, ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে, আলগোছে। “কাউকে কিছু দিলে ছুঁড়ে দিতে নেই” — এই সুন্দর শিক্ষা আমি যাঁদের কাছ থেকে পেয়েছি তাঁদেরই এহেন আচরণ আমায় বিস্মিত করেছিল। শুনেছিলাম, নোটটি তাঁর হাতে ছুঁইয়ে দিলে নাকি অপর প্রান্তের মানুষটি অশুদ্ধ হয়ে যায়। বুঝিনি নোটের একপ্রান্তের মানুষ যদি এইভাবে অশুদ্ধ হতে পারে তাহলে অন্যপ্রান্তের মানুষটি সেই একই ভাবে শুদ্ধ হয়ে যায় না কেন? আরও প্রশ্ন জেগেছিল যে পারিশ্রমিকটি তাঁর হাতে দূর থেকে প্রায় ছুঁড়েই দেওয়া হল সেটি বিভিন্ন হাত ঘুরে আমাদেরই ব্যাগে, আলমারিতে, বিছানায় এসে পড়বে না তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? মনের দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য রবি ঠাকুরের কবিতার আশ্রয় নিলাম—

“এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করো মন ধরো হাত সবাকার।
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব
অপমানভার।” ‘ভারততীর্থ’

এই ভাবেই রবিঠাকুরের হাত ধরে শুরু হল আমার বড় হয়ে ওঠা। তখন আমি বোধহয় ক্লাস এইট। শুনলাম আমাদের বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান হবে। অনেক লোক নিমন্ত্রিত হবে, ছাদে ম্যারাপ বাঁধা হবে। এর আগে আমাদের বাড়িতে এত বড় অনুষ্ঠান হয়নি। তাই মনে মনে দিনটার প্রতীক্ষা শুরু করে দিলাম। দেখলাম, আমার পিঠোপিঠি দাদা, যে দাদা ছিল আমার সর্বক্ষণের খেলা আর খুনসুটির সঙ্গী, তাকে উপবীত ধারণ করিয়ে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করা হবে। কয়েকদিন তাকে থাকতে হবে আলাদা একটি ঘরে। শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ ছাড়া আর অন্য কোনও মানুষ এ ক'দিন তার মুখ দেখতে পারবে না। আরো অবাক হয়ে দেখলাম নেড়া মাথা, গলায় কয়েক গাছি সাদা সুতো, ধুতি পাঞ্জাবী পরা আমার দাদাকে বয়স্ক অব্রাহ্মণ মানুষরা প্রণাম করছেন অবলীলায়। ছোটরা বড়দের প্রণাম করবে আবাল্য শিখে আসা এই নিয়ম কয়েক গাছি সুতোর মহিমায় একেবারে পাল্টে গেল? আরো প্রশ্ন জাগল মনে — দাদার যদি পৈতে হয় তবে আমার নয় কেন?
উত্তর পাইনি সেদিন। এর উত্তর আমি পেলাম আরো অনেক পরে রবি ঠাকুরের নাটকে—

“মেয়েমানুষ, তোমরা এখানে কী করতে।
কালের রথযাত্রায় কোনও হাত নেই তোমাদের।
কুটনো কোটো গে ঘরে।” (রথের রশি - নাটক)

এভবেই শুরু হল আমার মেয়েবেলা আরো অনেক প্রশ্নের জন্ম দিতে দিতে। তার কিছুদিন পরের একটা ঘটনা আমি আজও ভুলতে পারিনি। আমাদের এক বন্ধুর বাড়িতে বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে গেলাম। বন্ধুটি তার মায়ের সাথে আলাপ করিয়ে দিল। যা আমি ছোটবেলা থেকে শিখে এসেছি, দেখে এসেছি সেই অভ্যাসেই বন্ধুর মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। একজন বয়স্ক মানুষকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার জন্য বড়দের কাছে প্রচণ্ড বকুনি খেতে হল। আচমকা এই অদ্ভুত শাসনের কারণ খুঁজতে গিয়ে বুঝলাম যে আমার বন্ধুরা মুসলমান। শুধু তাই নয় গরীব মুসলমান। তাই এখানে অন্য নিয়ম। এক জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হলাম সেদিন আবার। বয়স্ক মানুষের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করাই যখন রীতি তাহলে এখানে কি ভুল করলাম? এর উত্তরও আমি পেয়ে গেলাম রবি ঠাকুরের কাছে—

“সেই স্নেহের ডাকে যখন তাহারা অশ্রু গদগদ কণ্ঠে সাড়া দিল না তখন আমরা তাহাদের উপর ভারি রাগ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম এটা নিতান্তই ওদের শয়তানি। একদিনের জন্যও ভাবি নাই আমাদের ডাকের মধ্যে গরজ ছিল কিন্তু সত্য ছিল না। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে একটা সাধারণ সামাজিকতা আছে, যে সামাজিকতার টানে আমরা সহজ প্রীতির বশে মানুষকে ঘরে ডাকিয়া আনি, তাহার সঙ্গে বসিয়া খাই, যদি-বা তাহার সঙ্গে আমাদের পার্থক্য থাকে সেটাকে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া দেখিতে দিইনা—সেই নিতান্ত সাধারণ সামাজিকতার ক্ষেত্রে যাহাকে আমরা ভাই বলিয়া আপন বলিয়া মানিতে না পারি দায়ে পড়িয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ভাই বলিয়া যথোচিত সতর্কতার সহিত তাহাকে বুকে টানিবার নাট্যভঙ্গি করিলে সেটা কখনোই সফল হইতে পারে না।

এক মানুষের সঙ্গে আর-এক মানুষের, এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর-এক সম্প্রদায়ের তো পার্থক্য থাকেই, কিন্তু সাধারণ সামাজিকতার কাজই এই—সেই পার্থক্যটাকে রূঢ়ভাবে প্রত্যক্ষগোচর না করা। ধনী-দরিদ্রে পার্থক্য আছে, কিন্তু দরিদ্র তাহার ঘরে আসিলে ধনী যদি সেই পার্থক্যটাকে চাপা না দিয়া সেইটেকেই অত্যুগ্র করিয়া তোলে তবে আর যাই হউক দায়ে ঠেকিলে সেই দরিদ্রের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে যাওয়া ধনীর পক্ষে না হয় সত্য, না-হয় শোভন।’

(‘লোকহিত’ - প্রবন্ধ)

এভাবেই নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আর অন্বেষনের মধ্যে দিয়ে রবি ঠাকুরের আশ্রয়ে পথ চলতে চলতে

একদিন যে মানুষটার হাত ধরলাম জানলাম সেও সেই একই লড়াই লড়ে চলেছে তার নিজের জীবনে। শুরু হল আমাদের একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আলোর পথ যাত্রা। এই চলার পথে আমাদের মন্ত্র জোগালেন সেই রবীন্দ্রনাথই—

"আমারই চেতনার রঙে পান্না হোল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে—
জ্বলে উঠল আলো
পূবে পশ্চিমে।"

('আমি' - শ্যামলী কাব্যগ্রন্থ)

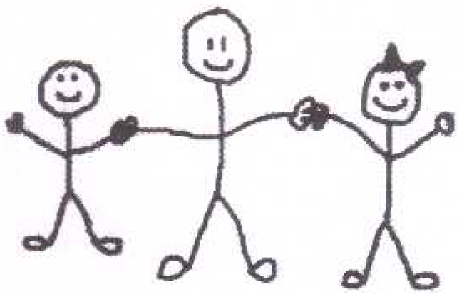

আত্মকথা দর্শনে

অনুপ দেওয়ানজী

হাতে পেয়ে আটখানা
আহ্লাদেতে দাঁতখানা
আকর্ণ বিস্তৃত
মুখে তবু হাসি স্মিত।

চোখে দেখে উচ্চশির,
আত্মবিশ্বাস সুগভীর,
গর্বেতে ভরে বুক,
আত্মকথায় আত্মসুখ।

পাতা উল্টে ছানাবড়া,
বিস্ময়েতে আছে ভরা,
লেখার পরে লেখায় রাঙ্গা,
করছে মোদের মনকে চাঙ্গা।

আনন্দাশ্রু শেষ পাতায়
আত্মকথার সার্থকতায়।
আছে দুঃখ, আছে সুখ।
আত্মকথা বেড়ে উঠুক।।

কলকাতা
২৪শে জানুয়ারী, ২০১৬

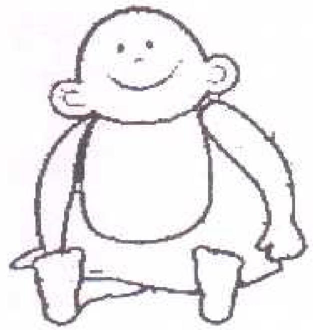

মিষ্টি সকাল

তাপস চক্রবর্তী

সজনে পাতায় চিকন চিকন আলো
ঘুঁচলো বুঝি আঁধার রাতের কালো।
সূয্যিমামা টুকুর টুকুর পায়ে
আলতো ছোঁয়ায় হাত বুলিয়ে গায়ে
কাঠবিড়ালীর ঘুম ভাঙিয়ে গেল।

মাছরাঙারও ঘুম টুটেছে গাছে
গাছকোটরে মুখ বাগিয়ে আছে।
শামুক মায়ের পিটুল পিটুল ছানা
পুকুরপাড়ে আহ্লাদে আটখানা
তাই দেখে ঐ গঙ্গাফড়িং নাচে।

রাতবিরেতে টহলদারি সেরে
হুতুমপেঁচা সকাল সকাল ফেরে।
সাতটি ঘোড়ায় সূয্যিমামার গাড়ি,
হিজলগাছে গাঙশালিখের বাড়ি
ঝুমুর ঝুমুর রোদ্দুরে দেয় ভ'রে।

সবাই যখন ঘুম ছেড়ে চোখ খোলে
খোকন কেন ঘুমিয়ে মায়ের কোলে?
প্রথম আলোর স্পর্শ গায়ে মেখে
উঠবে খোকন মায়ের মুখটি দেখে
পুঁইমাচানে মিষ্টি সকাল দোলে।

বড্ড গরম

সুবির ব্যানার্জি

আচ্ছা গরমটা কি খুউউউব পড়েছে? মানে এত তাপ আগে সহ্য করতে হয়নি? যাই হোক নেতারা বলছেন যে ঘামাচি হয়নি, প্রবল চুলকানি হয়নি, ঘন ঘন ল্যাক্টোক্যালামিন লাগাতে হচ্ছে না—তাও গরম গরম করে হেদিয়ে যাওয়া, ভোটের বাজারে চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই না।

চা খাচ্ছিলাম দুপুরের গন্‌গনে্‌ রোদে। ভাবলাম গরমে গরম মারবে। দোষের মধ্যে বলে ফেলেছি — উঃ কি গরম।

ব্যাস। চাওয়ালা জিজ্ঞেস করে বসলো, দাদা ব্যাঙ্কে কত জমা? গরমটা একটু বেশি ফিল করছেন না? উনুনের পাশে আটটা থেকে আটটা থাকি আমি।

অতএব ভাড় ফেলে চম্পট দিতে হলো। এখন বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। গরমটা সয়ে গেছে।

সিয়াচেন — একটি গোলাপের নাম

স্বপন নস্কর

পটভূমিকা

সিয়াচেন একটি পরিচিত নাম আপামর ভারতবাসীর কাছে। এই ভারতীয়দের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষই নিজেদের দেশপ্রেমিক দাবী করেন এবং এখানে যুদ্ধের নামে যে প্রহসন গত কয়েক দশক ধরে হয়ে চলেছে তাতে বেশ গর্বিত বোধ করেন। যে দুটি দেশ এই যুদ্ধের খেলাঘর বানিয়েছেন তাদের কেউ কারোর থেকে কম যান না এই ব্যাপারে। এক অবুঝ আবেগের, অদ্ভুত বহিঃপ্রকাশ এই যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা চলে আসছে গত কয়েক দশক ধরে।

সিয়াচেন কথার অর্থ হল 'প্রচুর জংলী গোলাপ'। ৭০ কিমি দীর্ঘ এই হিমবাহ মানুষের বসবাসের অযোগ্য এবং বেশ কিছুটা পিছনে যদি আমরা ফিরে যাই তাহলে এটি ছিলো আসলে অভিযাত্রীদের জন্য আকর্ষণ। প্রচুর গোলাপ ফোটানো ছাড়া অন্য কোনো কাজ ছিলো না এখানে। হয়তো এভাবেই থেকে যেত সিয়াচেন নামে এই হিমবাহ। যদি না ১৯৪৯ সালে করাচী চুক্তিতে ইউ এন প্রতিনিধিদল সীমানা টানতে গিয়ে NJ৯৮৪২ ম্যাপ কো-অরডিনেটে এসে থমকে দাঁড়াতেন আর ভেবে নিতেন যে এই দুর্গম তুষার অঞ্চল যা বসবাসের পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত সেটা নিয়ে দুই দেশের মধ্যে কোন বিবাদ হবে না। আর এই ভাবনাকে মিথ্যা প্রমাণ করে দিয়ে শুরু হল এক ঐতিহাসিক বিতর্ক যার শুরুটা আমরা জানি কিন্তু শেষ কোথায় তা জানিনা।

কীভাবে ১৯৪৯ সালে করাচী চুক্তিতে যা ছিলো CFL (Cease Fire Line), ১৯৭২ সালে সিমলা চুক্তিতে হয়ে গেল তা LOC (Line of Control), আর কীভাবেই বা তা বর্তমানে AGPL (Actual Ground Position Line) হয়ে গেল সেই বিতর্কে আমি যেতে চাইনা। শুধু বলি এই জায়গাটির অন্যতম পরিচিতি এই মুহূর্তে পৃথিবীর উচ্চতম যুদ্ধক্ষেত্র হিসাবে। যুদ্ধে নিহত শহীদ সৈনিকদের ছবিতে মালা পরানো, শত্রুপক্ষের ঘাঁটিতে দুর্জয় হানার সংবাদে আনন্দে হাততালি দেওয়া ছাড়া আমরা এই তথ্যটি আমাদের সন্তান-সন্ততিদের জানিয়ে রাখতে পারি জেনারেল নলেজ হিসাবে। যে যুদ্ধ চলেছে গত কয়েক দশক ধরে তাতে অর্থ কত ব্যয় হয় আর তার কতটা প্রয়োজনীয়

আমাদের এই গরীব দেশের জন্য এই সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা বৃথা। তাই সে চেষ্টা না করাই ভালো।

আর একটি কথা না বলে এই ভূমিকা শেষ করা ঠিক হবেনা। গত কয়েক দশক ধরে এই যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেছেন দুটি দেশের প্রায় দু'হাজার মানুষ। এদের বেশীরভাগই কিন্তু কোন যুদ্ধ বা এনকাউন্টারে মারা যাননি। প্রায় সবাই মারা গেছেন শুধুমাত্র খারাপ আবহাওয়ার কারণে। কখনো তুষার ঝড়, কখনো হিমবাহের ধাক্কায়, কখনো বা ধ্বংস নেমে দুই দেশের এক অদ্ভুত দেশপ্রেমের মাশুল হিসাবে নিয়ে গেছে এত গুলো প্রাণ। যার সাম্প্রতিক উদাহরণ হলেন সুবেদার নায়েক হনুমান থাপ্পা যিনি গত ৩রা ফেব্রুয়ারি আরও দশজন সৈন্যর সাথে বরফ চাপা পড়েন এবং অবিশ্বাস্য ভাবে বেঁচে থাকেন ১১ই ফেব্রুয়ারি অবধি। দেশপ্রেমের এক অদ্ভুত জোয়ার তাঁকে বীর শহীদ করে তুলেছিল বেশ কিছুদিন। আজ এই মুহূর্তে তিনি সম্ভবত বিস্মৃত এক অতীত মাত্র।

সিয়াচেন - একটি গোলাপের নাম

শেষতম তুষারযুগ থেকে বরফে ঢাকা দিলাম এই আমি
পড়ে ছিলাম নিস্তব্ধ নিথর যেন এক মৃত উৎসব
স্বপ্ন কোন ছিল না আমার, প্রত্যাশাও ছিল না কারোর আসার
আর এই নিঃসঙ্গতা ভেঙ্গে দেবার
আমার দুচোখ জুড়ে ছিল শুধু আমের আঠার মত ঘুম।
উচ্চাশা ছিল না কোন ঘরবাড়ি, লোকজন, বসতি
জনপদ গড়ে তোলবার।
মাঝরাতে কয়েকটি জেগে থাকা তারার দিকে তাকিয়ে
আমি কখনো হেসেছি কখনো বা কেঁদেছি একা একাই...
আর কখনো কখনো আমার বুকের উপরে জেগে উঠত কয়েকটি গোলাপ
বিনা কারণেই।

শুধু চেয়ে থাকতাম সেই মানুষটির জন্য,
যার দুপায়ে চাকা আর দুচোখ জুড়ে সপ্ন
যার হৃদয়ের মধ্যে শুধু আমাকে পাবার তীব্র বাসনা।
সে আসতো তুষার শৃঙ্গ পেরিয়ে
দুহাতের তালুতে জীবন আঁকড়ে ধরে রেখে
আকাশের ওই তারা গুলোকে সাক্ষী রেখে
সে আমার কাছ থেকে চেয়ে নিত তার প্রিয়তম নারীর জন্য
একটি গোলাপ।

তারপর আমি দেখলাম;
শুধু অবাক হয়ে দেখলাম ওগো ভালোমানুষের দল
তোমরা কেমন বন্ধুকে শত্রু বানালে
ভালোবাসাকে ঘৃণায় বদলে নিলে
আর আমার চারপাশ ঘিরে দিলে কাঁটাতার দিয়ে।

এভাবেই শুরু হল তোমাদের অবিরাম আত্মহনন
আর আমি এখানেই পড়ে রইলাম বুকে নিয়ে হিমবাহ
কোনদিন এখানে হবে না কোন গোলাপের আয়োজন
এই সত্য মেনে নিয়ে।

অথচ কথা ছিল আমি একটা নদী পাঠাবো তোমাদের দেশে
কথা ছিল একটা ঝর্না পাঠিয়ে দেব তোমাদের জন্য,
কথা ছিল নদীর দুপাশ ভরে যাবে ফসলের উচ্ছ্বাসে
আর কথা ছিল তোমরা সবাই মিলে একটা মস্ত রান্নাঘর বানাবে
পৃথিবীর সব মানুষেরা যাতে রেঁধে বেড়ে খেতে পারে সেই খানে।
আর আমি এই হিমবাহ বুকে নিয়ে বসে থাকব
কোনদিন যদি সূর্যের আলো এসে ফুটিয়ে তোলে কয়েকটি গোলাপ
আর সে আসতো আমার কাছে এক মুহূর্তের জন্য
শুধু একটি মাত্র গোলাপ চেয়ে নিতে।

তবু কেন ওগো ভালোমানুষের দল,
তোমরা শুধু শুধু মাঠের দুপাশে ফুল ফোটাবার কাজ ফেলে রেখে
পড়ে আছো এই যুদ্ধ সাজ!
যদি জানোই আমি কষ্ট পাই বারুদের গন্ধ ভরা বাতাসে
যদি জানোই আমি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লে তুষার ঝড় হয়ে আছড়ে পড়ি
তোমাদের তাঁবুর উপর।

কেন আমায় জাগিয়ে তোল।
আমার ক্রোধ, আমার ক্ষুব্ধ অভিমান
যদি আজ ঢেকে দিতে চায় তোমাদের অস্ত্রাগার,
ঘুম থেকে জেগে উঠে
তোমরাও কেন আমার কাছ থেকে চেয়ে নাওনা একটা করে গোলাপ
আর তারপর ফিরে যাও যে যার নিজের দেশে।

আর আমি এখানেই বসে থাকি একাকী নিঃসঙ্গ
শুধু সেই মানুষটির প্রতীক্ষায়
তার দুপায়ে চাকা, তার দুচোখে স্বপ্ন
সে আসবে তুষার শৃঙ্গ পেরিয়ে বরফগলা কাদাজল পায়ে মেখে
প্রথম প্রেমিকের মত সে এসে দাঁড়াবে আমার বুকের উপর।
তারপর আমার চোখে চোখ রেখে সে চেয়ে নেবে একটি মাত্র গোলাপ
তার প্রিয়তম নারীর জন্য।

With Best Compliments
from

Rajnandini Chatterjee

With Best
Compliments
from

Surajit Dawn